দেশ-বিদেশের বিচিত্র আলাপন-৩০

খন্দকার জাহিদ হাসান

চন্দ্রবাসীদের পৃথিবী পরিদর্শন-১

[অবশেষে রু ও শিউ তাদের সাড়ে চার সেন্টিমিটার দীর্ঘ মহাকাশযান 'মেন্‌জিক'-এ চেপে পৃথিবীর কাছাকাছি পৌঁছে গেল। মহিলা নভোযাত্রী রু ছিল তিন সদস্যবিশিষ্ট অভিযাত্রী দলের প্রধান। তার পুরুষ সহযাত্রী শিউ ছিল নাম্‌কাওয়াস্তেই তার আজ্ঞাবাহী সহকারী। আসলে কাজের কাজ তেমনটি হত না তাকে দিয়ে। তবে সে পারত দারুণ ঝগড়া করতে। রু-ও কম যেত না। প্রায় চার লক্ষ কিলোমিটার পথের প্রায় পুরোটা ওরা ঝগড়া করেই কাটিয়ে দিল।

অভিযাত্রী দলের তৃতীয় জন ছিল স্বয়ং মেন্‌জিক , যা ছিল একাধারে একটি ক্ষুদে নভোযান এবং রোবটও। ওরা আসছিল চাঁদের উল্টো পিঠ থেকে। পৃথিবীর এই উপগ্রহটিতে জীবনের কোনো অস্তিত্ব নেই বলে মানুষের ধারণা। কিন্তু আসলে খুব অল্পমাত্রায় হলেও সেখানে প্রাণের বিকাশ ঘটেছে। এদের মধ্যে আবার আর্থ্রোপোডা পর্বের অন্তর্গত পাঁচ মিলিমিটার দৈর্ঘ্যের হ্যাকুয়াস্ নামের পতংগরা বুদ্ধিবৃত্তির দিক থেকে মানুষের সমপর্যায়ে চলে গিয়েছিল। রু ও শিউ ছিল এমনই দুই হ্যাকুয়াস্।

ওদের নিজস্ব পরিভাষায় পৃথিবীকে ওরা বলত 'তেই' আর চাঁদকে বলত 'মেই'। ওদের মহাকাশযান মেন্‌জিক যখন ভূ-পৃষ্ঠ থেকে মাত্র আড়াই হাজার কিলোমিটার দূরে, তখনও রু ও শিউ ঝগড়া করছিল।]

শিউঃ নাহ্! আমাদের পলিস্কোপ তেইকে আর ঠিকমতো পড়তে পারছে না। খুব দ্রুতই বড়ো বেশী বিশাল আর বেঢপ হয়ে উঠছে পাজী গ্রহটা!

রুঃ তাতে অসুবিধাটা কোথায়? আবার নতুন করে পলিস্কোপ অ্যাড্‌জাস্ট্ করলেই তো হয়!

শিউঃ এবার নিয়ে ক'বার অ্যাড্‌জাস্ট্ করা হল, সেটা খেয়াল আছে? তুমি তো কেবল নির্দেশ দিয়েই খালাস!

রুঃ শিউ, তুমি বড্ডো আল্‌সে! এই মুহূর্তে আমরা দ্রুত তেই-এর দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। এখন তো ঘনঘন পলিস্কোপ অ্যাড্‌জাস্ট্ করতে হবেই।...আর তা ছাড়া আমি বসে বসেও সময় কাটাচ্ছি না, আমার অনেক দায়িত্ব। সুপার ফ্লায়িং-এর সকল ঝক্কি তো আমাকেই পোহাতে হল। আর....

শিউঃ আমার ঘাট হয়েছে। এখন বলো, পলিস্কোপে কোন্ ধরণের অ্যাড্‌জাস্ট্‌মেন্ট্ করব, কুনিয়ালিয়া, না শাইবোমিয়া?

রুঃ এই অভিযানে তোমাকে নেওয়াটাই ভুল হয়েছে। তোমার আরো বেশী প্রশিক্ষণের দরকার ছিল।

[তারপর রু শিউকে বোঝাতে শুরু করল কোন্ অ্যাড্‌জাস্ট্‌মেন্টের কী কাজ। শিউ ব্যাজার মুখে রু-এর কথা শূনতে থাকল। আসলে তার ভেতর এক ধরণের মিশ্র অনুভূতি কাজ করত। রু-এর কথায় সে অপমান বোধ করলেও তার এই সাহচর্যকে শিউ উপভোগও করত। কারণ রু ছিল দারুণ সুন্দরী এক হ্যাকুয়াস্। ওর মুখমন্ডল যেন বিধাতার অনেক যত্নে গড়া এক অপূর্ব শিল্পকর্ম।

রু-এর শর্ট ক্লাস শেষ হলে শিউ কাজে নেমে পড়ল। বেশ কিছুক্ষণ পর রু তাকে জেরা আরম্ভ করল।]

রুঃ শিউ, কি বুঝছ? তেই সম্বন্ধে নতুন কিছু তথ্য পেলে?

শিউঃ হুঁ-উ-উ।

রুঃ কি তথ্য?

শিউঃ অশ্বডিম্ব! ভয়ংকর সব জীবাণু আর নির্বাক সব পোকামাকড়ে ভরা একটা ফাল্তু আর ধাড়ি গ্রহ হল এই তেই। ওখানে কোনো বুদ্ধিমান প্রাণী নেই। আমরা অযথাই আমাদের শক্তি আর সময় নষ্ট করছি।

রুঃ এখনই শেষ কথা বলার সময় হয়নি শিউ। এখনো আমরা তেই থেকে অনেক দূরে। এত দূর থেকে কুনিয়ালিয়া বা শাইবোমিয়া— কোনো পদ্ধতিতেই নিশ্চিত হওয়া সম্ভব নয় যে, তেইয়ে বুদ্ধিমান প্রাণী আছে কি নেই।... ইয়ে, ভাল কথা, তুমি তো একজন জীববিজ্ঞানী। তেই-এর পোকামাকড়গুলো কোন্ ধরণের তা কি ধরতে পেরেছো?

শিউঃ আমাদের মতো আর্থ্রোপোডা পর্বের অন্তর্ভুক্ত বলেই তো মনে হয়।

রুঃ এটা একটা সু-সংবাদ। ওদের অনেকের-ই বুদ্ধিবৃত্তি রয়েছে বলে আশা করছি।

শিউঃ আর্থ্রোপোডা হলেই বুদ্ধি থাকবে, এমনটি না-ও হতে পারে। আমাদের গ্রহের বারকুয়াস্রাও তো আর্থ্রোপোডা। কিন্তু ওদের মতো অপদার্থ আর গবেট প্রাণী আর দ্বিতীয়টি দেখেছ?

[রু আর কোনো মন্তব্য করল না। শেষ পর্যন্ত ক্ষুদে নভোযান মেন্জিক ভূ-পৃষ্ঠ থেকে দশ কিলোমিটার দূরত্বের মধ্যে পৌঁছে গেল। শিউ-এর চাপা কণ্ঠ শোনা গেল।]

শিউঃ নীচের এই তেই গ্রহটা এত প্রকান্ড যে, এর কোনো কূল-কিনারা দেখতে পাচ্ছি না!

রুঃ তোমাকে এ নিয়ে ভাবতে হবে না। মেন্জিক কি বলছে শোনো।

শিউঃ মেন্জিকের ভাব-বিনিময় ব্যবস্থা আপাততঃ বন্ধ করে রাখা হয়েছে।

রুঃ (বিরক্তকণ্ঠে) তোমার কি মাথা-টাথা খারাপ নাকি? এখন মেন্জিকের সাথে আমাদের কথা বলা দরকার। ওর ভাব-বিনিময় ব্যবস্থা শিগ্রী চালু করো।

[রু-এর কথা শেষ হওয়ার আগেই শিউ তার নির্দেশ পালন করে ফেল্ল। কিছুক্ষণ কাঁই-কুঁই শব্দ হওয়ার পর আভ্যন্তরীণ স্পীকার হতে মেন্জিকের যান্ত্রিক কণ্ঠঃস্বর ভেসে এলো।]

মেন্জিকঃ হ্যাঁ বলো, কি জানতে চাইছো তোমরা।

রুঃ আচ্ছা, তেই সম্বন্ধে কিছু বলো।

মেন্জিকঃ এই মুহূর্তে আমরা তেই-পৃষ্ঠ থেকে প্রায় সাত কিলোমিটার দূরে আছি।

শিউঃ সে তো অল্টিমিটারেই দেখতে পাচ্ছি। আরো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্বন্ধে কিছু বলো।

মেন্জিকঃ আর নীচে নামা ঠিক হবে না। কারণ নীচে একটা বিশাল জলাধার রয়েছে। ওখানে ল্যান্ড্ করার কোনো জায়গা নেই।

শিউঃ ল্যান্ড্ না থাকলে আবার ল্যান্ড্ করার প্রশ্ন ওঠে কিভাবে?

রুঃ শিউ, তুমি চুপ করো তো। আর মেন্জিক, তুমি আর নীচে নেমো না। এখন আনুভূমিকভাবে এগোতে থাকো। ডাঙ্গা খুঁজে বের করো।

মেন্‌জিকঃ ডাঙ্গা খুঁজে বের করা চাট্টিখানি কথা নয়। এই জলাধারটি খুব-ই বিশাল। সত্যি কথাটা হলোঃ তেই গ্রহটাই একেবারে যাচ্ছেতাইভাবে প্রকান্ড। কোনো হদিস্ করা মুশ্‌কিল।

শিউঃ (উপহাসচ্ছলে) কি, আমার কথা ঠিক হল তো! কেন, বললাম না....

রুঃ (ধম্‌কে উঠে) শিউ, তুমি থামবে! আমি মেন্‌জিকের সঙ্গে কথা বলছি।

মেন্‌জিকঃ হ্যাঁ, যা বলছিলাম। এই গ্রহটা আসলেই খুব বিরাট।

রুঃ কি যা-তা বকে চলেছো সেই তখন থেকে? আমরা লক্ষ লক্ষ কিলোমিটার দূরত্ব পাড়ি দিয়ে এখানে এলাম। আর এই সামান্য গ্রহটাকে চষতে পারবো না!

মেন্‌জিকঃ দেখ, মহাকাশ পাড়ি দেওয়ার সময় আমি সুপার ফ্লাইং করেছি। এখন তো আর সেটা সম্ভব নয়। বর্তমান গতিবেগে তেইকে চষে ফেলা একটু কঠিন-ই বটে।... তবু দেখি কতোদূর কি করা যায়!

[মেন্‌জিক তখন পৃথিবীর সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে সাড়ে ছয় কিলোমিটার ওপর দিয়ে উড়ে চলেছিল। নীচে ছিল বঙ্গোপসাগর। বেশ কিছুক্ষণ পর মেন্‌জিক আবার মুখ খুল্‌ল।]

মেন্‌জিকঃ ডাঙ্গার গন্ধ পাচ্ছি।

শিউঃ ডাঙ্গার আবার গন্ধ হয় নাকি? পাগল কাঁহাকার!

মেন্‌জিকঃ শুধু ডাঙ্গা কেন, সব কিছুর-ই গন্ধ রয়েছে। আমি সব কিছুর-ই গন্ধ পাই। আমাকে সেভাবেই তৈরী করা হয়েছে। তুমি তো সব জানোই শিউ।

রুঃ মেন্‌জিক, শিউ-এর কথা ধোরো না তো! এখন বলো ডাঙ্গা আর কতোদূরে।

মেন্‌জিকঃ আর মাত্র ত্রিশ কিলোমিটার দূরে। তারপর আমরা অবতরণ করতে পারবো।

রুঃ ডাঙ্গা দেখতে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অবতরণের দরকার নেই। আমরা বুঝেশুনে ল্যান্ড্ করবো। আপাততঃ ধারা-বিবরণী দিতে থাকো। আর শিউ, তুমি সৌর-চুল্লীটা একটু পরীক্ষা করে দেখ। ওটা ঠিকমতো কাজ না করলে জৈব-চুল্লীটা চালু করে দাও।

[শিউ এতক্ষণ মনমরা হয়ে বসে ছিল। কাজ পেয়ে যেন বেঁচে গেল। ওদিকে নভোযান-তথা-রোবট মেন্‌জিক তার আভ্যন্তরীণ স্পীকারের মাধ্যমে ধারা-বিবরণী দিতে থাকল।]

মেন্‌জিকঃ বাইরে এই মুহূর্তে বৃষ্টি হচ্ছে। আমরা সূর্যের দিকে অবস্থান করলেও যেহেতু এখন আকাশ ঘন মেঘে ঢাকা, সেইহেতু সৌর-চুল্লী কাজ করার কথা নয়। এবং আমি সেটা ইতিমধ্যেই টের পেতে আরম্ভ করেছি। আমার গতিবেগ বজায় রাখা আস্তে আস্তে কঠিন হয়ে পড়ছে।.... আমার একটা ছোট্ট অনুরোধ রয়েছে।

রুঃ কি অনুরোধ?

মেন্‌জিকঃ তেইতে অবস্থানকালে সার্বক্ষণিকভাবে জৈব-চুল্লী চালু রাখার ব্যবস্থা করো তোমরা। কেননা, মেঘ ও রাত্রির কারণে এখানে আমরা প্রায়ই সূর্যালোক থেকে বঞ্চিত হবো।

রুঃ তোমার অনুরোধ রাখা হবে।

মেন্‌জিকঃ ধন্যবাদ রু। আর এইমাত্র জৈব-চুল্লীটা চালু করে দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ শিউকেও।... যা হোক, নীচে বেশ ছোট একটা ডাঙ্গার গন্ধ পাচ্ছি।

ডাঙ্গাটা চলন্ত। মনে হয় জলযান। ওটিতে জীবেরও গন্ধ পাচ্ছি। আমরা কি নেমে দেখবো? তোমরা তো প্রাণের অস্তিত্বের সন্ধানেই এখানে এসেছো।

রুঃ তা বটে। তবে এখন আমরা নামবো না। মূল ভূ-খন্ডে যাবো। তা ছাড়া জলযানের জীবেরা আমাদের জন্য নিরাপদ না-ও হতে পারে।

মেন্‌জিকঃ আমি আঁচ করছি যে, জলযানের জীবগুলো আকারে খুব-ই বড়ো। আমরা হয়তো তাদের নজরেই পড়ব না।

শিউঃ হ্যাঁ, পলিস্কোপের মাধ্যমে আমিও এইমাত্র নিশ্চিত হলাম যে, জীবগুলো আসলেই বিশাল।

রুঃ কি রকম বিশাল?

শিউঃ একেকটা প্রায় দেড় হতে দু'মিটার দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট। এরা চারপেয়ে হলেও পেছনের দু'পায়ের ওপর ভর করে খাড়াভাবে দাঁড়িয়ে আছে এবং চলাফেরা করছে।

রুঃ আর সামনের পা দু'টো?

শিউঃ ও দু'টো দিয়ে কি যেন সব করছে তারা।

রুঃ ওরা কি আমাদের মতো আর্থ্রোপোডা গোছের প্রাণী?

শিউঃ এখনো অতোটা ধরতে পারছি না। তবে সম্ভবতঃ তোমার প্রশ্নের উত্তর হলোঃ না। আর্থ্রোপোডারা চারঠেঙ্গে হয় বলে কখনো শুনিনি। কমপক্ষে তাদের ছয় ঠ্যাং থাকতেই হবে।.... নীচের ঐ প্রাণীগুলো যে কোন্ পর্বের, তা এখনও ধরতে পারছি না। তবে হ্যাঁ, জলযান যখন ব্যবহার করতে পারে, তখন নিঃসন্দেহে ওরা বুদ্ধিমান। আমরা তাদের সংগে ভাবের আদান-প্রদান করার চেষ্টা করতে পারি।

মেন্‌জিকঃ শিউ-এর প্রস্তাবটা মন্দ নয়। এখান থেকে মূল ভূ-খন্ড বেশী দূরে নয়। তেমন সুবিধা না হলে ওদিকেই চম্পট দেওয়া যাবে। কি বলো রু?

রুঃ (দীর্ঘশ্বাস ফেলে) ঠ্যালা সামলাও এবার! বেশী বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন রোবট নেওয়ার এই হল বিপদ। তার ওপর আবার আমাদের বাহন। (নরম সুরে) ঠিক আছে। চলো, নেমে দেখা যাক।

[অতএব মেন্‌জিক ঘুরে ঘুরে নীচে নেমে এল। শিউ-এর যেন আর তর সইছিল না। আসলে নীচে সাগরের বুকে বেশ ক'টি জেলে নৌকা ভেসে বেড়াচ্ছিল। সেগুলো দৃষ্টিগোচর হতেই শিউ চেঁচিয়ে উঠল।]

শিউঃ আরেব্বাস! কি বিরাট বিরাট সব জলযান!!

মেন্‌জিকঃ বলেছিলাম না!.... আর ঐ যে দেখ, ওগুলোর ওপর চেপে কিম্ভুতকিমাকার সব দৈত্য কেমন দাপাদাপি করছে!

রুঃ দাপাদাপি নয় মেন্‌জিক, ওরা সবাই কাজ করছে।

মেন্‌জিকঃ যা-ই হোক। এখন ওদের সাথে ভাব করো।

রুঃ সে কর্মটি তোমাকেই শুরু করতে হবে মেন্‌জিক। শোনো, তুমি যে-কোনো একটা জলযানকে কেন্দ্র করে উড়তে থাকো। আর সেই সাথে তোমার বাইরের লাউড স্পীকারের মাধ্যমে আমাদের সেই গৎবাঁধা বার্তাটি প্রচার করতে থাকো। দেখা যাক, কি হয়!

মেন্‌জিকঃ আচ্ছা, ঠিক আছে। (একটা জেলে নৌকার চারিদিকে ঘুরে ঘুরে উড়তে উড়তে বাইরের লাউড স্পীকারের মাধ্যমে) ওহে তেইবাসী দৈত্যাকার প্রাণীরা! আমরা এসেছি লক্ষ লক্ষ কিলোমিটার দূরের সেই উপগ্রহ মেই থেকে— মহাকাশ পাড়ি দিয়ে। তোমরা কি আমার কথা শুনতে ও বুঝতে পারছো?... আমি আসলে একটা মহাকাশযান। আর আমার ভেতরে

রয়েছে মেইবাসী দু'জন বুদ্ধিমান আরোহী— দলপ্রধান রু ও তার সহযাত্রী শিউ। ওরা তোমাদের সংগে ভাব করতে চায়....

[দৈত্যাকার প্রাণীগুলো কোনো সাড়াই দিল না। যেন তারা মেন্‌জিকের উপস্থিতি টের-ই পায়নি। মেন্‌জিক আরো একবার শুভেচ্ছা বার্তাটি পাঠ করল। কোনোই লাভ হল না।]

রুঃ মেন্‌জিক, তোমার ভাষাটা একটু পরিবর্তন করো তো! ওরা এত বিশাল বিশাল সব প্রাণী। আমার মনে হয়, ওদেরকে আর একটু শ্রদ্ধা মেশানো ভাষায় সম্বোধন করা উচিৎ। তা ছাড়া তুমি ওদের আরো কাছাকাছি যাও। তোমার কথা হয়তো ওরা শুনতেই পাচ্ছে না।

[মেন্‌জিক রু-এর নির্দেশ পালন করল।]

মেন্‌জিকঃ প্রিয় তেইবাসী বিশালাকার বিশাল হৃদয়ের প্রাণীগণ! যেহেতু তোমরা জলযান চালাতে পারো, সেইহেতু নিঃসন্দেহে তোমরা খু-উ-ব বুদ্ধিমান। তোমরা কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছো? আমরা এসেছি সেই....

[নীচের নৌকাগুলোতে উপকূলবাসী কিছু জেলে মাছ ধরছিল। মেন্‌জিক আগের নৌকা ছেড়ে আরেকটা নৌকার কাছে গেল এবং আগের মতো ঘুরে ঘুরে শুভেচ্ছাবাণী পড়তে থাকল। ঐ নৌকাতে বড়োদের সাথে ফরিদ নামের নয় বছরের একটি ছেলেও ছিল। সে এসেছিল তার বাবা মন্টু মিঞা ও বড়ো চাচা ফতেহ্ আলীর সাথে মাছ ধরতে। হঠাৎ সে মেন্‌জিককে দেখতে পেল এবং তার চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল।]

ফরিদঃ বাবা, দেখ, দেখ! কি সুন্দর একটা বেগুণী রং-এর ফড়িং আমাদের মাথার ওপর চক্কর দিচ্ছে।

মন্টু মিঞাঃ (ফরিদের দৃষ্টি অনুসরণ করে) তাই তো রে! এমন আজব ধরণের ফড়িং বাপের জন্মেও দেখিনি! তবে এর পাখনাটা খুব-ই ছোট।

ফতেহ্ আলীঃ(কাজ করতে করতে) কামের সময় কি সব আজেবাজে বকছিস্ তোরা? ছেলের সংগে তুইও কি ছেলেমানুষ হয়ে গেলি মন্টু? এজন্যই তখন ফরিদকে সাথে নিতে বারণ করেছিলাম তোকে।

মন্টু মিঞাঃ না, ভাইজান। ফরিদের কথাটা মিথ্যা না। আপনি একবার ফড়িংটার দিকে চেয়েই দেখেন না!

ফতেহ্ আলীঃ(উড়ন্ত মেন্‌জিকের পানে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে) হ্যাঁ, এটা একটা আজব রকমের ফড়িং-ই বটে। তবে এমনটা যে আগে দেখিনি, তা নয়। যুদ্ধের বছর এ-ধরণের এক ঝাঁক ফড়িং আমি একবার আমাদের বাড়ীর পেছনের মাঠে দেখেছিলাম। আমি তখন ফরিদের বয়সেরই হবো। আর তুই মা'র কোলে। বাপজান তখনো বেঁচে।

ফরিদঃ তারপর কি হল বড়চাচা? ফড়িংগুলো কি তোমার মাথার ওপর এটার মতোই চক্কর দিচ্ছিল?

ফতেহ্ আলীঃহ্যাঁ, তবে ওরা মাত্র দু'বার চক্কর দেবার পরপরই ঝাঁক ধরে জংগলের দিকে চলে যায়।

ফরিদঃ আর ফিরে আসেনি?

ফতেহ্ আলীঃনাহ্, আর কখনোই তাদেরকে দেখিনি। পরে আমি বাপজানকে ঘটনাটা বলি। তবে উনি আমার কথা তেমন বিশ্বাস করেননি।

[নৌকার ওপর ঘুরতে থাকা মেন্‌জিক নামের নভোযানটার দিকে সবাই অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। ওটা এখন বেশ নীচে নেমে এসেছে। ফরিদের বাবা মন্টু মিঞার মাথায় দুষ্টুমী বুদ্ধি খেলা করতে থাকে।]

মন্টু মিঞাঃ কিরে ফরিদ, ধরে দেবো নাকি ফড়িংটাকে?

ফরিদঃ (উৎসুক চোখে) পারবে ধরতে?

ফতেহ্ আলীঃওটা ধরে লাভ কি? তোর যতো ছেলেমানুষি কথা!

মন্টু মিঞাঃ লাভ না থাক, লোকসান তো নেই কোনো! অন্ততঃ একটা বাড়িটাড়ি তো দেওয়া যাক।

[বলতে বলতে মন্টু মিঞা হাতের বৈঠাটা ধাঁই করে মেন্‌জিকের দিকে চালাল। ফড়িংটাও পাঁই করে নাগালের বাইরে চলে গেল। ফরিদ আর্তনাদ করে ওঠে।]

ফরিদঃ বাবা, মেরো না, মেরো না ফড়িংটাকে!

মন্টু মিঞাঃ তুই অমন চেল্লাচ্ছিস্ কেন?

ফরিদঃ ফড়িংটা কি যেন একটা কথা বলতে চাইছে আমাদেরকে!

ফতেহ্ আলীঃ(ফরিদের বাবার উদ্দেশ্যে) থাক, মারিস্ না। (হাসতে হাসতে) আর তোর পাগল ছেলের কথা শোন্! ফড়িংটা নাকি আমাদের সাথে কথা বলতে চাইছে!

ফরিদঃ বিশ্বাস করো বড়োচাচা, ফড়িংটা আসলেই কথা বলছে! তোমরা সবাই একটু চুপ করো, তা হলেই শুনতে পাবে।

[সবাই চুপ করে এবং কান খাড়া করে থাকে। ফড়িংটা বেশ কিছু দূরে সরে গিয়ে এক জায়গায় স্থির হয়ে ভাসছিল। কিছুক্ষণ পর সবার আগে মন্টু মিঞা মুখ খোলে।]

মন্টু মিঞাঃ কই, আমি তো ফড়িংটার এক ভোঁ-ভোঁ আওয়াজ ছাড়া আর কিছুই শুনতে পাচ্ছি না।

ফতেহ্ আলীঃআমিও না।

ফরিদঃ তোমরা কি যে বলোনা! ঐ তো, এইমাত্র আমি শুনতে পেলাম, ফড়িংটা বলছেঃ আমরা লাখ লাখ কিলোমিটার দূর থেকে তোমাদের পৃথিবীতে এসেছি। তোমরা আমাদেরকে মারতে চাইছো কেন?

মন্টু মিঞাঃ তুই থাম্ তো ফরিদ! তোর মাথা খারাপ হয়ে গেছে!

ফরিদঃ (কাঁদো কাঁদো গলায়) বিশ্বাস করো, ওটা বলছে, ও নাকি একটা ক্ষুদে রকেট। ও একা নয়, ওর পেটের ভেতর আরো দু'টো জন্তু রয়েছে। ওরা....

মন্টু মিঞাঃ থাক, আর বক্‌বক্ করিস্ না। তুই এখন একটু চুপচাপ শুয়ে থাক। আমার মনে হয়, তোর জ্বর আসছে।... কই দেখি তোর কপালটা....

[ফরিদ অভিমানবশতঃ দ্রুত সরে যায়। তারপর চোখ মুছতে থাকে। ওদিকে ক্ষুদে চন্দ্রবাসীরা নিজেদের মধ্যে আলাপ করতে থাকে।]

মেন্‌জিকঃ রু, তোমার কথা শুনে ওদের অতোটা কাছে যাওয়া আমার উচিৎ হয়নি। দেখলেই তো, আর একটু হলেই কেমন কুপোকাত্ হচ্ছিলাম!?

শিউঃ তুমি ঠিকই বলেছো। ঐ দৈত্যের বাড়িটা ঠিকমতো তোমার গায়ে পড়লে কি অবস্থা হতো আজ, তা ভেবে দেখেছো?

রুঃ হুঁ-উ। কিন্তু আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, দৈত্যটা হঠাৎ অমন ক্ষেপে উঠল কেন!

মেন্‌জিকঃ আমার ধারণাঃ ও ভেবেছিল যে, আমি ওদেরকে আক্রমণ করতে যাচ্ছি।... যা হোক, ও-সব কথা বাদ দাও। এখন ঐ ছোট দৈত্যটা সম্বন্ধে

কিছু বলি। তোমরা কি লক্ষ্য করেছ যে, ওর কথার তরংগ আমরা পাঠ করতে পেরেছি?

রু ও শিউঃ(সমঃস্বরে) হ্যাঁ, ঠিক বলেছো।

শিউঃ শুধু তা-ই নয়। ওদের মধ্যে একমাত্র ও-ই বন্ধুভাবাপন্ন।

রুঃ আমার মনে হয় ঐ ক্ষুদে দৈত্যটা বড়োগুলোর বাচ্চা-টাচ্চা হবে।

মেন্‌জিকঃ হ্যাঁ, হতে পারে। তবে ও আসলেই খুব ভাল। বড়ো দৈত্যরা শুধু হাঁউ-কাঁউ আর ভঁ-ভঁ আওয়াজ করে। অথচ দেখ, ক্ষুদেটা কি সুন্দর কথা বলে!

শিউঃ খাঁটি কথা। এমনকি ধাড়ি দৈত্যটা যখন মেন্‌জিককে আঘাত করতে আসছিল, তখন ক্ষুদেটা তাকে বারণও করেছিল।

মেন্‌জিকঃ হ্যাঁ, ক্ষুদেটা বলছিলঃ ওই উড়ন্ত পতংগটাকে মেরো না!

শিউঃ (হেসে উঠে) তার মানে, মেন্‌জিককে ওরা শুধুমাত্র পতংগ ভেবেছে। ও যে একটা অত্যাধুনিক মহাকাশযান, সেটা বোকাগুলো ঠাহর-ই করতে পারেনি। বেকুব আর কাকে বলে!

রুঃ না, আমি মনে করি যে, ক্ষুদে দৈত্যটা বেকুব নয়।

মেন্‌জিকঃ শুধু তা-ই নয়, চেষ্টা করলে ওর সাথে ভাব জমানো যাবে। ও কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমার কথা বুঝতে পেরেছে। তোমরা কি শুনতে পাওনি ওর কথা?

শিউঃ পাবো না কেন? আমরা যে নভোযানে চেপে অনেক দূর থেকে এখানে এসেছি, তাও সে বুঝতে পেরেছে।

রুঃ যাই হোক, এখন থেকে আমরা কেবল ক্ষুদে দৈত্যদের সাথেই ভাব-বিনিময় করব।

[এরপর মেন্‌জিক বঙ্গোপসাগরের আকাশ ছেড়ে বাংলাদেশের মূল ভূ-খন্ডের দিকে এগোতে শুরু করল। উপকূলের কাছাকাছি তিনটি জাহাজ ভাসছিল। সৈকতে কয়েকজন বাচ্চা ছেলেমেয়ে ছোটাছুটি করছিল।]

মেন্‌জিকঃ বাহ্-বাহ্! বৃষ্টি আর নেই! কি সুন্দর সূর্যের আলো!!... ওরে বাবা, ঐ চেয়ে দেখ কত্তো বড়ো বড়ো জলযান ভাসছে! আগেরগুলো এগুলোর কাছে নস্যি। আমার ধারণা, এই জলযানগুলোতে আরো বিশাল সব দৈত্য রয়েছে।

শিউঃ না, তোমার ধারণা সঠিক নয় মেন্‌জিক। আমি পলিস্কোপে দেখতে পাচ্ছি যে, এই প্রাণীগুলোও আকারে ও প্রকারে আগেরগুলোর মতোই।

রুঃ যাকগে। এখন ওদিকে যাওয়ার দরকার নেই।

মেন্‌জিকঃ জলের ধারে অনেক ক্ষুদে দৈত্য ছোটাছুটি করছে। কথা বলবে নাকি ওদের সংগে?

রুঃ না-না, এখন না। আর ক্ষুদে দৈত্য হলেই যে খুব ভাল হবে, এমন কোনো কথা আছে নাকি?

শিউঃ আমার মতে, ভবিষ্যতে কোনো বাচ্চা দৈত্যকে একা পেলে দেখেশুনে অতি সাবধানে তার সাথে ভাব-বিনিময়ের চেষ্টা করা যেতে পারে। হুট্ করে কিছু করা ঠিক নয়। তুমি কি বলো রু?

রুঃ (ঠোঁটে প্রশংসাসূচক হাসি ফুটিয়ে) ধন্যবাদ শিউ। সিদ্ধান্তগ্রহণের ব্যাপারে তোমার বেশ উন্নতি হয়েছে দেখছি! চমৎকার!!

শিউঃ দুশ্চিন্তা কোরো না। আমি কখনোই তোমার নেতৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করব না। তোমার অধীনে কাজ করতেই আমার বরং ভাল লাগে।

রুঃ আর কি ভাল লাগে?

শিউঃ তোমার মুখ ঝাম্‌টা খেতে।

রুঃ বটে!

মেন্‌জিকঃ তোমরা দেখছি আবার ঝগড়া শুরু করলে।

শিউঃ এটা ঝগড়া নয় মেন্‌জিক।

মেন্‌জিকঃ তা হলে কি প্রেমালাপ?

শিউঃ এটা আমাদের আভ্যন্তরীন ব্যাপার। যা বোঝ না, তা নিয়ে কথা বলতে এসো না। তুমি তোমার কাজ করে যাও।

মেন্‌জিকঃ আমি তো আমার কাজ করে যাচ্ছিই। এই যে দেখ, কেমন উড়ে চলেছি!

শিউঃ আর ধারা-বিবরণী?

মেন্‌জিকঃ ও হ্যাঁ, দুঃখিত!.... নীচে অসংখ্য প্রাণী ও উদ্ভিদের গন্ধ পাচ্ছি। জলের গন্ধও পাওয়া যাচ্ছে। সেই সাথে মাটির গন্ধ। তেই-এর নরম মাটি।

রুঃ (চিন্তিত কণ্ঠে) আচ্ছা মেন্‌জিক। কিছুক্ষণ আগে আমরা যখন দৈত্যাকার প্রাণীদের কাছাকাছি চলে গিয়েছিলাম, তখন কি তুমি ওদের কোনো বিশেষ ধরণের গন্ধ পেয়েছিলে?

মেন্‌জিকঃ হ্যাঁ পেয়েছিলাম। তবে গন্ধটা আমার অচেনা ছিল। বেশ টের পাচ্ছিলাম যে, ওরা জীব এবং প্রাণী। কিন্তু কি ধরণের প্রাণী, সেটা ধরতে পারছিলাম না।

শিউঃ এ নিয়ে আমিও ভেবে চলেছি। আমার জীববিদ্যাগত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার আলোকে আমিও প্রাণীগুলোকে সনাক্ত করতে পারছি না। আমাদের মেই-এর 'কিক্‌লু' নামের প্রাণীদের সাথে এই দৈত্যগুলোর কিছুটা সাদৃশ্য রয়েছে। কিন্তু আকারে কিক্‌লুরা এদের চাইতে অনেক ছোট। এমনকি ঐ ক্ষুদে দৈত্যটার চেয়েও ছোট।

রুঃ যাই হোক। অতো ভেবে কোনো লাভ নেই। চলো, এবারে আমরা ধীরেসুস্থে তেই-পৃষ্ঠের আরো কাছাকাছি চলে যাই, উড়তে থাকি এবং সবকিছু পর্যবেক্ষন করতে থাকি।

মেন্‌জিকঃ কতোটা কাছাকাছি?

রুঃ এই ধরো, দশ মিটার।

মেন্‌জিকঃ অতো কাছে গেলে ক্রুজিং করতে অসুবিধা হবে।

রুঃ কি ধরণের অসুবিধার কথা বলছো?

মেন্‌জিকঃ তেই-পৃষ্ঠে খুবই বড়ো বড়ো সব উদ্ভিদ রয়েছে। সেগুলোকে পাশ কাটিয়ে কাটিয়ে এগোনো কষ্টকর হবে।

রুঃ ও নিয়ে ভেবো না। জানোই তো আমার পাইলটিং-এর গ্রেড সর্বোচ্চ মানের। আমিই তোমাকে অনায়াসে উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারবো। আপাততঃ নামতে থাকো। সেই ফাঁকে আমি তোমার নিয়ন্ত্রণভার পুরোপুরি নিয়ে ফেলি।

[কিছুক্ষণ পর রু-এর নিয়ন্ত্রণে নভোযান-তথা-রোবট 'মেন্‌জিক' মাটি থেকে মাত্র দশ মিটার ওপর দিয়ে উড়ে চলল। প্রথমে তারা উড়ে গেল কাবিলুদ্দিনের ধানক্ষেতের ওপর দিয়ে। তারপর তারা পাড়ি দিল রমেশ পালের 'তালবেড়ে' নামের ছোট্ট পুকুরটা। পুকুরের পাড়ে অবস্থিত কালিমন্দিরের ছাদে তারা অবতরণ করবে কি করবে না, তা বুঝে উঠতে না উঠতেই শ্যাওলা-পড়া-ছাদ আর নোনা-ধরা-দেওয়ালবিশিষ্ট দেড়শ' বছরের পুরাতন মন্দিরখানা পেরিয়ে গেল তাদের নভোযান। অতঃপর মেন্‌জিক যখন কিপ্‌টে তমসা বুড়ীমা'র নিকোনো ঝক্‌ঝকে উঠোনটা পেরোতে যাচ্ছিল, তখন হঠাৎ করেই রু ও শিউ- দু'জনেরই জায়গাটা দারুণ পছন্দ হয়ে গেল। উঠোনের এক কোণে অবস্থিত এক মিটার বাই এক মিটার আকারের

মুরগীর ঘরের মরচে ধরা ছাদে অবতরণ করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল তারা। পাঁই পাঁই করে ঘুরতে ঘুরতে রু দক্ষ হাতে নির্ধারিত জায়গাতে মেন্‌জিককে ল্যান্ড্ করাল।

তমসা বুড়ীমা সেই মুহূর্তে তার মুরগীগুলোর সাথেই বক্‌বক্ করছিল। জীবজন্তু, পোকামাকড়, গাছপালা, এমনকি মাটিকাদা কিংবা হাঁড়িপাতিলের সংগেও দিনরাত কথা বলার একটা বাতিক ছিল তমসা বুড়ীমা'র।। (কল্প-কাহিনী), (চ-ল্-বে- - -)

সিডনী, ২৬/০৬/২০০৯

লেখকের আগের লেখাগুলো পড়তে এখানে টোকামারুন